বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা কার্তিক ১৩৯৭

থাইল্যাণ্ডের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয় কতিপয় দিক

এম, খোরশেদ আলম*

ভূমিকা

বিগত তিন দশকে থাইল্যান্ড যে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে, তা এক বিস্ময়কর সাফল্য হিসেবে অভিহিত হচ্ছে। ১৯৬১ সালে যখন প্রথম জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সচেষ্ট হয়, তখন থেকেই দেশটি দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকে, এবং ঐ সকল দেশের মধ্যে অন্যতম হিসেবে আবির্ভূত হয় যারা উচ্চ, দীর্ঘমেয়াদী ও মুদ্রাস্ফীতিহীন প্রবৃদ্ধি, ফি বছর গড়ে ৭-৮ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং ৫ শতাংশ বা তারও কম হারে প্রতি বছর গড়-নিম্ন-মুদ্রাস্ফীতিতে অবস্থান করেছে (Komin, 1989)। থাই অর্থনীতি তার প্রাধান্যপূর্ণ কৃষি ভিত্তি হ'তে আজ এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যেখানে শিল্প এবং বহির্বাণিজ্য অর্থনীতির প্রধান নিয়ামক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

আজকের থাইল্যাণ্ড সাফল্যলাভে সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পায়িত জাতি হিসেবে অভিহিত হয়েছে এবং একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমুখী দেশ হিসেবে তার পরবর্তী উন্নয়নের সোপান নির্ধারণ করেছে। যদিও বিশ্ব অর্থনীতির অধিকাংশই আজ মন্দা কবলিত, কিন্তু থাইল্যান্ড অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্মুখ সারিতে। আশির দশকে, বিশ্ব তৈল বাজারে অবিরাম সংকট সত্বেও, থাইল্যাণ্ডের গড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটে মাত্র কয়েকটি দেশ তা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমানে দেশটি শিল্পোন্নয়নের এক নতুন অধ্যায় শুরু করার উদ্যোগ ত্বরান্বিত করেছে। চমৎকার বিনিয়োগ পরিবেশ, দারুণ উদার নীতিমালা এবং সেই সংগে শিল্প-পণ্য উৎপাদনে সক্ষমতা ও নিম্ন ঝুঁকিবিহীন প্রত্যার্পণ সুবিধা বিদেশী পুঁজি ক্রমবর্ধমান হারে আকর্ষণ করছে। অর্থনৈতিক উন্নতি আর সমৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্রুত ধাবমান এ গতিতে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হইনি।

এক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে—কি সেই অবদানমূলক উপাদান যা দেশটিকে যুক্তিযুক্তভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উচ্চস্তর অর্জন এবং কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতি থেকে ম্যানুফেকচারিং ও সেবাখাতভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরে সক্ষম করেছে?

---

* গবেষণা কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের অর্থনীতির সমস্যা ও সম্ভাবনাকে বিবেচনায় রেখে থাই অর্থনীতির কতিপয় অবদানমূলক উপাদান আলোচনা করা হয়েছে, যা আমাদের জন্যও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সরকারী নীতিমালা

অবশ্য থাইল্যান্ডের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুফল বহনকারী উপাদান বহুমুখী ও বহুমাত্রিক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানমূলক উপাদান হিসেবে সর্বপ্রথমে উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সরকারী বিভিন্ন নীতিমালার কথা উল্লেখ করা দরকার। একথা এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, থাইল্যাণ্ডের অর্থনীতি দীর্ঘ ৩০ বছরের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে।

উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ সূচিত হয়েছিল ১৯৬১ সালে এক নিয়মাবদ্ধ উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে। ঐ পর্যায়ে, পাশ্চাত্যের উদার দর্শন ও ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত সরকারী কর্মকর্তা, বিশেষ করে যারা ইতঃপূর্বে ইউরোপ ও আমেরিকায় তাঁদের দৃষ্টিভংগিকে বিস্তৃত এবং দেশের জন্য উপযোগী চিন্তাধারা আত্মভূত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার্থে প্রেরিত হয়েছিল, তাঁরা এ উদ্যোগে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। অবাধ অর্থনীতি বা মুক্ত বাজারনীতি অর্থনৈতিক দর্শন হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। এ সূত্রেই, প্রথম ষষ্ঠবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬), দ্বিতীয় (১৯৬৭-৭১) এবং তৃতীয় (১৯৭২-৭৬) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল। শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে আমদানী বিকল্পন নীতি গ্রহণ, পূর্বে আমদানী হত এমন পণ্যাদির দেশে উৎপাদন উৎসাহিতকরণ এবং অর্থনীতির চকমপ্রদ প্রবৃদ্ধির ভিত্তি হিসেবে কাজ করার উপযোগী মৌলিক ও ভৌত অবকাঠামো তৈরী করা হয় (NIO, 1984)।

তিরিশ বৎসরকালব্যাপী গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সরকারী নীতিমালা থাইল্যাণ্ডের এই উজ্জ্বল সামগ্রিক অর্থনীতিক চিত্র উপহার দিয়েছে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সূচনাকাল থেকে বিগত ৩০ বছরে দেশটি গড়ে প্রতি বছর ৭.৭ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় বিশ গুণ এবং মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় সতেরো গুণ। ১৯৬১ সালের ২,২০০ বাথ থেকে ১৯৮১ সালে ১৭,২৫০ বাথে এবং ১৯৯০ সালে ৩৫,৫০০ বাথে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে (Viravan, 1992)।

সারণি-১ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯০-এর হিসাবানুযায়ী বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি হচ্ছে ২১০ ডলার, যেখানে থাইল্যাণ্ডের হচ্ছে ১,৪২০ ডলার। ১৯৬৫-৯০ সালে বাংলাদেশ এবং থাইল্যান্ডের মাথাপিছু জিডিপির গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ০.৭ ও ৪.৪ শতাংশ (WB, 1992)।

সারণি – ১

কতিপয় মৌলিক তথ্য

	জনসংখ্যা (মিলিয়ন) মধ্য–১৯৯০	আয়তন (হাজার বর্গ কিলোমিটার)	মাথাপিছু জিডিপি	
			ডলার ১৯৯০	গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (শতাংশ) ১৯৬৫–৯০
বাংলাদেশ	১০৬.৭	১৪৪	২১০	০.৭
থাইল্যাণ্ড	৫৫.৮	৫১৩	১,৪২০	৪.৪

সূত্র ঃ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৯২ হতে সংকলিত।

সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে আমাদের যা দৃষ্টিগোচর হয় তা হচ্ছে, থাইল্যাণ্ড পশ্চাৎপদ কৃষিনির্ভরতা থেকে আজ এক নতুন শিল্পায়িত অর্থনীতির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে (সারণি–৩ দ্রষ্টব্য)।

উৎপাদন বহুমুখীকরণ

থাইল্যাণ্ডের উৎপাদন বহুমুখীকরণের সরকারী উদ্যোগ এবং সে লক্ষ্যে প্রণীত উদার নীতিমালা হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা দেশটিকে সমৃদ্ধির সন্তোষজনক স্তরে উপনীত করেছে। থাইল্যাণ্ড তার কৃষি ও শিল্প উভয় খাতেই বহুমুখীকরণে সমর্থ হয়। বিগত তিন দশকে থাইল্যাণ্ডের কৃষি খাত দর্শনীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। বিগত তিন দশকে কৃষি খাতে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪–৫ শতাংশ। কৃষকদের জন্য প্রদত্ত সরকারী প্রণোদনা কৃষিজ উৎপাদন বর্ধনে অভাবনীয় সাহায্য করে। একক শস্য উৎপাদনকারী দেশ থেকে থাইল্যাণ্ড আজ ৫/৬টি প্রধান শস্যের উৎপাদন ছাড়াও অন্য প্রায় অর্ধ–ডজন সেকেণ্ডারী দ্রব্য এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ফার্ম পণ্যের উৎপাদনকারী। থাইল্যাণ্ড আজ বিশ্বের বৃহত্তম চাল রপ্তানীকারী দেশ।

সারণি - ২

প্রধান শস্যের উৎপাদন, নির্বাচিত বছর, ১৯৬০-৮৬

(হাজার টনে)

শস্য	.৬০	.৭০	.৭৫	.৮১	.৮৫	.৮৬
চাল	৬,৭৭০	১৩,৪১০	১৩,৩৮৬	১৭,৮০০	২০,৫৯৯	১৯,০২৬
রাবার	১৭১.৪	২৮৭.২	৩৪৮.৭	৫০২.০	৭২২.০	৭৯০.০
ভূট্টা	৫৪৩.৯	১,৯৩৮.২	২,৮৬৩.২	৪,০০০.০০	৫,০৩০.০	৪,০৯২.০
ক্যাসাভা	১,২২২	৩,৪৩১	৮,১০০	১৭,৭৪৪	১৯,২৬৩	১৫,২৫৫
ইক্ষু	৫,৩৮২	৬,৫৮৫	১৯,৯১০	৩০,২৬০	২৪,০০০	২৪,৪০০
বাদাম	১৫২	১২৪.৯	৯৯.৯	১৪৬.৫	১৭১.০	১৭১.০
সয়াবিন	২৫.৬	৫০.৪	১১৩.৯	১৩১.৫	৩০৭.৮	৩৫০.০

সূত্র ঃ কোয়াটারলি বুলেটিন, ব্যাংক অব থাইল্যাণ্ড, জুন, ১৯৮৭, পৃঃ ৭৫।

ম্যানুফেকচারিং খাতে বহুমুখীকরণের বিস্তৃতি এবং ফলাফল আরও চমকপ্রদ, বিশেষত এখন সকল ধরনের হালকা শিল্প পণ্যই স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত হচ্ছে। অধিকন্তু, দেশটি মৌলিক ও ভারী শিল্পও স্থাপন করেছে। উৎপাদন প্রযুক্তি আমদানীকৃত যন্ত্রাংশের এসেম্বেলিং স্তর থেকে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত যন্ত্রাংশের সংযোজন স্তরে উপনীত হয়েছে। এখন দেশটি নিজস্ব ব্রাণ্ড নাম প্রবর্তন এবং ডিজাইন উন্নীতকরণ স্তরে আরও অগ্রগতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

সারণি - ৩

উৎপাদন কাঠামো

	জিডিপি (মিঃ ডলার) ১৯৬৫-১৯৯০	মোট দেশজ উৎপাদনের বন্টন (শতাংশ)								
		কৃষি ১৯৬৫-১৯৯০		শিল্প ১৯৬৫-১৯৯০		ম্যানুফেকচারিং ১৯৬৫-১৯৯০		সেবা ইত্যাদি ১৯৬৫-১৯৯০		
বাংলাদেশ	৪,৩৮০	২২,৮৮০	৫৩	৩৮	১১	১৫	৫	৯	৩৬	৪৬
থাইল্যাণ্ড	৪,৩৯০	৮০,১৭০	৩২	১২	২৩	৩৯	১৪	২৬	৪৫	৪৮

সূত্র ঃ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৯২ হতে সংকলিত।

সারণি—৩ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯০ সালের হিসাবানুযায়ী বাংলাদেশের মোট জিডিপি হচ্ছে ২২.৮৮ বিলিয়ন ডলার, অন্যদিকে একই সময়ে থাইল্যাণ্ডের জিডিপি হচ্ছে ৮০.১৭ বিলিয়ন ডলার। অথচ ১৯৬৫ সালে এ দুটি দেশেরই জিডিপি মোটামুটি কাছাকাছি ছিল (বাংলাদেশের ৪.৩৮ এবং থাইল্যাণ্ডের ৪.৩৯ বিলিয়ন ডলার)। বিগত

পঁচিশ বৎসরে বাংলাদেশের মোট জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.২২ গুণ, অন্যদিকে থাইল্যান্ডের বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.২৬ গুণ।

সারণি—৩ থেকে এটিও দৃষ্টিগোচর হয় যে, ১৯৬০–এর দশক থেকে থাইল্যাণ্ডের অর্থনীতিতে এক বিস্ময়কর কাঠামোগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বাংলাদেশ এবং থাইল্যাণ্ড উভয় দেশেই সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে কৃষি খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের তুলনায় থাইল্যাণ্ডের হ্রাসের হার অনেক বেশী। থাইল্যাণ্ডে জিডিপি–তে কৃষির অবদান অবিচলভাবে (steadily) হ্রাস পেয়েছে—১৯৬৫ সালের ৩২.০ শতাংশ থেকে ১৯৯০ সালে ১২.০ শতাংশে। অবশ্য এ চিত্র এ কথা বলে না যে, এ সময়কালে দেশটি কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যর্থ হয়েছে। এর প্রাথমিক কারণ হচ্ছে অর্থনীতির অন্যান্য খাতের দ্রুত সম্প্রসারণ। যদিও কৃষি খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে, তথাপি এ কথা বলা যায় যে, আগামী দিনের অনাগত বছরগুলোতেও কৃষি থাই অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। থাইল্যাণ্ডে ১৯৬০–৬৫, ১৯৬৫–৭০ এবং ১৯৭০–৭৭ সময়কালে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৫.২, ৫.৭ ও ৩.৮ শতাংশ। ১৯৬০–৭৭ সময়কালে থাই কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ৪.৯ শতাংশ হারে (WB, 1980)।

সারণি - ৪

অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন (মিলিয়ন ডলার)

	কৃষি		ম্যানুফেকচারিং	
	১৯৭০	১৯৯০	১৯৭০	১৯৯০
বাংলাদেশ	৩,৬৫০	৮,৭২১	৫২৭	১,৭৩০
থাইল্যাণ্ড	১,৮৩৭	৯,৯৪৮	১,১৩০	১৭,৬৩৫

সূত্র ঃ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৯২ হতে সংকলিত।

অপরদিকে যদিও শিল্প ও ম্যানুফেকচারিং উভয় খাতেরই অবদান উভয় দেশেই বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি বাংলাদেশের তুলনায় থাইল্যাণ্ডে এই বৃদ্ধির হার অনেক বেশী। থাইল্যাণ্ডে ম্যানুফেকচারিং খাত খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে, জাতীয় আয়ে ১৯৬০ সালে এর অবদান ১১.৯ শতাংশ থেকে ১৯৮০ সালে ২০.৭ শতাংশে এবং ১৯৮৬ সালে ২১.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ১৯৭৯ সাল থেকেই ম্যানুফেকচারিং খাতের অবদান কৃষি খাতকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। ১৯৯২ সালে দেশটির জিডিপিতে ম্যানুফেকচারিং খাতের অবদান এসে দাঁড়ায় ২৬.২ শতাংশে, যেখানে কৃষির অবদান ছিল ১৩.১ শতাংশ (Viravan, 1992)।

সারণি – ৪ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭০ সালের তুলনায় ১৯৯০ সালে যেখানে বাংলাদেশে ম্যানুফেকচারিং খাতে মূল্য সংযোজন (Value addition) ৩.২৮ গুণ বেড়েছে, সেখানে থাইল্যাণ্ডে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫.৬১ গুণ। অন্যদিকে একই সময়ে বাংলাদেশে কৃষিতে মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি ঘটেছে ২.৩৯ গুণ, থাইল্যাণ্ডে এ বৃদ্ধির হার ৫.৪২ গুণ। ১৯৬০–৬৫, ১৯৬৫–৭০ এবং ১৯৭০–৭৭ সময়কালে থাইল্যাণ্ডে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১১.৩, ১০.৪ ও ৮.৫ শতাংশ, অন্যদিকে ম্যানুফেকচারিং খাতে একই সময়কালে এ হার ছিল যথাখমে ১০.৭, ১০.৩ ও ৯.৬ শতাংশ (WB, 1980)। এ উপাত্ত এই নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশের তুলনায় থাইল্যাণ্ডের অর্থনীতি অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ।

বেসরকারী খাতে প্রণোদনা

অপর ইতিবাচক অভিজ্ঞতা যা আমরা কাজে লাগাতে পারি তা হচ্ছে একটি শক্তিশালী বেসরকারী খাত গঠনে থাইল্যাণ্ডের সাফল্য। এটি বস্তুতপক্ষে ষাটের দশকের উষালগ্ন থেকে বেসরকারী বিনিয়োগে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উদার উদ্দীপনার ফসল। সরকার বাধ্য হয়েছিল অর্থনীতিতে তার হস্তক্ষেপ হ্রাস করতে। এ প্রক্রিয়ায়, এটি বেসরকারী খাতকে এগিয়ে আসতে প্রণোদিত করে। সরকারী ও বেসরকারী খাতের সহযোগিতাও সহগামীভাবে (Concomitantly) বৃদ্ধি পেয়েছে। বেসরকারী খাতের বিস্তৃত উন্নয়নে সুদৃঢ় সরকারী সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ফলে বেসরকারী উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে ওঠে এবং দিনকে দিন তা শক্তিশালী হতে থাকে। এক্ষেত্রে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট অথোরিটি অব থাইল্যাণ্ড (আইইএটি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৭২ সালে আইইএটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আইইএটি-এর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে শৃংখলাবদ্ধ ও পর্যায়ক্রমিক শিল্প উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী 'শিল্প এলাকা' (Industrial estate) স্থাপন করা। এ শিল্প অনেকাংশে 'শিল্প শহর' (Industrial city)-এর মতই। শিল্প এলাকা মৌলিকভাবে দু'টি জোনে বিভক্ত—সাধারণ শিল্প এলাকা এবং রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা। একটি সাধারণ শিল্প এলাকা হচ্ছে ঐ সকল শিল্প স্থাপনের জন্য যা রপ্তানী অথবা দেশীয় ভোগের জন্য দ্রব্যাদি তৈরী করে থাকে। অপরদিকে রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা হচ্ছে ঐ সকল শিল্প স্থাপনের জন্য যা কেবলমাত্র রপ্তানীর জন্য পণ্য তৈরী করে থাকে। একজন উৎপাদনকারীর পক্ষে শিল্প এলাকায় তার শিল্প কারখানা স্থাপনে প্রধান সুবিধা হচ্ছে খুবই যুক্তিসংগত অথবা কখনো কখনো হ্রাসকৃত মূল্যে মৌলিক অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদিসহ জমির মালিকানা অর্জন। অধিকন্তু উদ্যোক্তারা বিভিন্ন ধরনের সুবিধাদি গ্রহণের অধিকার পায়।

এ এলাকায় সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংক, হাসপাতাল, শপিং কমপ্লেক্স, টেলেক্স/পোষ্টঅফিস, স্কুল এবং শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন একই

কম্পাউণ্ডের মধ্যে অবস্থিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ (Self-contained community)। ঐ সমাজে আইইএটি থাই এবং অ-থাই উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্প স্থাপনের আবেদন করা থেকে শুরু করে পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত সকল পর্যায়ের সেবা ও সুবিধা One-stop-service-এর আওতায় প্রদান করে থাকে। ১৯৭২ সালে আইইএটি প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে শিল্প এলাকার স্থাপনা ব্যাংকক মেট্রোপলিটান এলাকা অতিক্রম করে আজ দেশের অন্যান্য প্রদেশেও সম্প্রসারিত হয়েছে।

বর্তমানে থাইল্যাণ্ডে মোট শিল্প এলাকার সংখ্যা হচ্ছে ৪২টি। তন্মধ্যে ৪টিতে পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন চলছে, ৮টি নির্মাণাধীন, ৩টির প্রস্তুতির কাজ চলছে, ২৩টির সমীক্ষা চলছে এবং ৪টি বিশেষ এসাইনমেন্টের অধীনে রয়েছে (IEAT, 1992)। যেখানে থাইল্যাণ্ডে বেসরকারী খাত অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর প্রবৃদ্ধির সক্রিয় এজেন্টে পরিণত হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে দুর্বল, দুর্নীতিগ্রস্থ ও আত্মবিশ্বাসহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশে বেসরকারী খাত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সম্ভাবনাময় ভাবমূর্তি গঠনে ব্যর্থ হয়েছে। থাইল্যাণ্ডে বেসরকারী খাতে যদিও সরকারী হস্তক্ষেপ ছিল এবং আছে, তদপুরি তা বাংলাদেশের মত প্রতিবন্ধকমূলক নয়, চরিত্রে এবং কার্যক্ষেত্রে সহায়তামূলক (supportive)। এ ক্ষেত্রে জাপানের উদাহরণও প্রাসংগিকভাবে আসতে পারে। জাপানের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংগে জাপানী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সৌহার্দ ও সহযোগিতা কিংবদন্তীর মত। আমাদের দেশে বেসরকারী খাতের প্রতি সরকার সাধারণত নিয়ন্ত্রণমূলক (regulatory) এবং কখনো কখনো প্রতিবন্ধকমূলক (restrictive) ভূমিকা পালন করেছে। নিয়ম আর নীতির এক অদ্ভুত বেড়াজাল আর কঠোর নিয়ন্ত্রণে বেসরকারী খাতকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অপরদিকে সরকার ও সাহায্যদাতাদের পক্ষ থেকে প্রায়শই অভিযোগ ওঠে আমাদের বেসরকারী খাত, যা যে-কোন বিশুদ্ধ মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রাণ, তার সততা আর দক্ষতা প্রমাণে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যক্তি উদ্যোগ এবং উদ্যোক্তা শ্রেণীর অভাব বর্তমানে এমন এক স্তরে উন্নীত হয়েছে যেখানে চিনি, বস্ত্র, ম্যাচ বক্স, ডিমসহ প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যই এখন প্রতিবেশী দেশ থেকে হয় আমদানী হচ্ছে অথবা চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে প্রবেশ করছে। আমাদের দেশের তথাকথিত উদ্যোক্তা অথবা শিল্পপতি শ্রেণীর মধ্যে যে প্রবণতাটি প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে তারা দেশে শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিবর্তে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসায় বেশী আগ্রহী।

সম্প্রতি সরকার দেশীয় উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে এবং একই সংগে বিদেশী পুঁজিকে আকৃষ্ট করতে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করছে। বস্তুতপক্ষে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে আকৃষ্ট এবং উদ্যোক্তাদেরকে পুনর্জীবিতকরণ এবং সহায়ক বিনিয়োগ পরিবেশ সৃজনে সরকারী নীতিমালার ঘোষণাই যথেষ্ট নয়। ক্রমবর্ধমান চোরাচালান, সংকুচিত বাজার, বৃহত্তর জনগোষ্ঠির নিম্ন ক্রয়ক্ষমতা, শিল্প এলাকায় শ্রমিক অসন্তোষ, দুর্বল অবকাঠামো, আমদানীকৃত কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, সরকার কর্তৃক ঘোষিত সুবিধাদি প্রাপ্তিতে জটিলতা, লোড শেডিং ও ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট, নিম্নশ্রম

উৎপাদনশীলতা, এবং সর্বোপরি প্রশাসনের সর্বস্তরে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি উদ্যোক্তা শ্রেণীকে অহরহ বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করছে। সাম্প্রতিককালে সরকারের অবাধ আমদানী নীতির কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে দেশীয় বিনিয়োগকারীরা নতুন শিল্প স্থাপনে উৎসাহ পাচ্ছে না । বিশ্ব বাজার এমনকি প্রতিবেশী দেশগুলোর সংগে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি না করে উদার আমদানী নীতি অথবা অবাধ বাজার নীতি প্রবর্তন করে প্রকারান্তরে দেশীয় শিল্প কারখানাগুলোকে সংকটের মধ্যে ফেলা হচ্ছে। এ প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর না হলে উদ্যোক্তা শ্রেণী এগিয়ে আসবে এমনটা আশা করাও বাতুলতামাত্র। অধিকন্তু, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতাও কখনো কখনো সমস্যাকে প্রকট করে তোলে। এসব কারণে সরকারের বিঘোষিত বাজার সহায়ক (Market friendly) নীতি সফলতার মুখ দেখছে না।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

অন্য এক সাফল্য যা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা হতে পারে তা হচ্ছে দেশটির বিগত তিরিশ বছরব্যাপী উন্নয়ন প্রচেষ্টায় এর অর্থনৈতিক উন্নয়নের শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করার অনুসংগ হিসেবে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন। মৌলিক এবং পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধাদি ছাড়া বেসরকারী উদ্যোগ নির্ভর এ সকল উন্নয়ন সম্ভব ছিল না। সরকার প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশটির সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি ; যথা—সেচ, পরিবহন, যোগাযোগ, ব্যাংকিং, শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক সংস্থার উন্নতি সাধনে ব্যাপক বিনিয়োগ করে। থাইল্যাণ্ড পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে। দেশটি একই সংগে স্থল, জল ও সমুদ্র পথে এক কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। অত্যাধুনিক এয়ারপোর্ট ও সমুদ্র বন্দরের সুবিধা এবং দেশব্যাপী রাস্তা ও হাইওয়ের ব্যাপক নেটওয়ার্ক দেশটির জাতীয় অর্থনীতির সকল খাতে চমকপ্রদ উন্নতির স্বাক্ষর প্রদান করে। অপরদিকে, আমাদের দেশে অবকাঠামো খুব দুর্বল। যদিও সম্প্রতি সরকার ভৌত এবং সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ খাতে এক উচ্চাভিলাষী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, সেবাদির মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদিতে দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণে বেসরকারী খাতকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

১৯৫৮ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত থাইল্যাণ্ড ফিল্ড মার্শাল সারিৎ থানারাত (১৯৫৮–১৯৬৩) এবং ফিল্ড মার্শাল থানম কিটিকাচরণ (১৯৬৩–১৯৭৩)-এর নেতৃত্বে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ভোগ করে। এ সময়কালেই থাই অর্থনীতি সম্প্রসারিত হয়েছে অপ্রত্যাশিত গতিতে। ১৯৩২ সালে সংঘটিত এক ক্যুদেতার মাধ্যমে দেশটি চরম রাজতন্ত্র (absolute monarchy) থেকে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। তখন থেকেই

দেশটি, মাত্র কয়েক বছরের আধা-গণতান্ত্রিক সরকার শাসিত শাসন ছাড়া একনায়কতান্ত্রিক সামরিক শাসক দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে (NIO, 1984)। কেবলমাত্র ১৯৬২ সালে এক রক্তক্ষয়ী গণজাগরণের পর প্রথমবারের মত এক অবাধ ও মুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং তার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসীন হয়। যদিও ক্ষমতাসীন শাসক সম্প্রদায় প্রায়শই ঘন ঘন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু তাতে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতিমালা কখনো প্রভাবান্বিত হয়নি। সময়ের দীর্ঘ পরিসরে মৌলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে (rational) অপরিবর্তিত থেকে গেছে, যা যে-কোনভাবেই হোক না কেন সরকারের পরিকল্পনা ও নীতিমালার মধ্যে ধারাবাহিকতা এবং দেশী ও বিদেশী পুঁজির নিরাপত্তা প্রদান করেছে। যদিও রাজনৈতিক গোলযোগ ও থাই রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ ঘটেছে ঘন ঘন, তথাপি শ্রমিক শ্রেণী খুবই শৃংখলাবদ্ধ এবং অসন্তোষ আর সন্ত্রাস থেকে প্রায় মুক্ত। অন্যদিকে আমাদের দেশের চিত্র প্রায় উল্টো। এখানে শিল্পখাতের শ্রমিক শ্রেণী এক নৈরাজ্যকর অবস্থায় আছে। ঘন ঘন ষ্ট্রাইক এবং কর্ম-বিরতি ইতিমধ্যে আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে দারুণভাবে বিঘ্নিত করেছে।

রপ্তানী-মুখী প্রবৃদ্ধি কৌশল

সত্তরের দশকের শুরু থেকেই থাইল্যাণ্ড এক বহির্মুখী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে। যদিও ১৯৬০-এর দশকে আমদানী পরিকল্পনার লক্ষ্যে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, ১৯৭০-এর দশকে এসে রপ্তানীমুখী পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে তা সফলতা অর্জন করে। এ পর্যায়ে বৈদেশিক বাজারের সংগে সংযোগ স্থাপনের জন্য আমদানী-বিকল্প-এর পরিবর্তে রপ্তানী-মুখী প্রবৃদ্ধি কৌশল গৃহীত হয়। সরকারও রপ্তানী-মুখী শিল্পে উৎসাহ প্রদান করে। এ কাজে দেশটি সফল হয়—রপ্তানীই হয়ে দাঁড়ায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি। জিডিপির অংশ হিসেবে, রপ্তানী ১৯৭১ সালের ১০.৯ শতাংশ থেকে ১৯৯১ সালে ৩০.৭ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। বিগত তিন দশকে মোট রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বার্ষিক ১৫ শতাংশ হারে। এ সময়কালে রপ্তানীর অবকাঠামোতেও কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গতানুগতিকভাবে, থাইল্যাণ্ড হচ্ছে কৃষি অর্থনীতি ভিত্তিক দেশ যেখানে কৃষি খাত দেশটির রপ্তানী আয়ের এক বিরাট অংশ জুড়ে ছিল। যদিও সময়ের পরিসরে রপ্তানীতে মোট কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, কৃষিজ রপ্তানী ১৯৬০ সালে ৮৪.৩৮ শতাংশ থেকে ১৯৮৬ সালে ৩৪.৩০ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে, মানুফেকচারিং দ্রব্যাদির রপ্তানী ১৯৬০ সালে মোট রপ্তানী আয়ের ২.৪ শতাংশ থেকে ১৯৮৬ সালে ৫৪.৯ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে (Komin, 1989)। সামগ্রিকভাবে, রপ্তানী খাতের সাফল্য সম্ভব হয়েছিল থাই রপ্তানী দ্রব্যাদির বিশ্ববাজারে মূল্য বৃদ্ধি, রপ্তানী বহুমুখীকরণ এবং রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে। এ ক্ষেত্রে থাইল্যাণ্ড

অত্যন্ত সফলতার সংগে জাপান এবং এশিয়ার নতুন শিল্পায়িত দেশসমূহকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। থাইল্যাণ্ডের রপ্তানীর দ্রুত বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে দ্রুততর করেছে, যা অনুসরণ আমাদের জন্যও উপকারী হতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য থাইল্যাণ্ড এক উন্নয়ন মডেল

নিঃসন্দেহে থাইল্যাণ্ডের অতীত অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে। যদিও থাইল্যাণ্ড উন্নয়নের জন্য কোন পূর্ণাংগ মডেল নয়, তথাপি উক্ত অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ আমাদের জন্য উপকারী হ'বে এ অর্থে যে তা আমাদের অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করবে। এ প্রসংগে বলতে হয়, সর্বপ্রথমে, আমাদেরকে অর্থনীতিকে ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে জাগ্রত করতে হবে। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে বিনিয়োগের কোন বিকল্প নেই। সরকারের উচিত দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য পর্যাপ্ত নীতি কৌশল গ্রহণ করা।

সর্বোপরি, আমাদের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে এক অংগীকারাবদ্ধ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব যারা দেশটি সামনের দিকে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর এবং সেই সংগে নীতিমালার ব্যাপারে সার্বিক (holistic) দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করবে।

থাইল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা থেকে একদিকে আমরা যেমন কিছু ইতিবাচক উপাদান পাই যা অনুসরণ আমাদের জন্য সুফলবাহী হতে পারে, তেমনি কিছু নেতিবাচক উপাদানও রয়েছে যা আমাদেরকে সতর্কতার সংগে পরিহার করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, থাইল্যাণ্ড এতকাল তার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত প্রভাব (environmental impact)-এর বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেনি। পরিবেশের বিষয়টি বিবেচনায় না এনে অপরিকল্পিতভাবে পর্যটন সুবিধা, শিল্প-কারখানা, নগরায়ন, গলফ ক্লাব ইত্যাদি সম্প্রাসরণের ফলে পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অপরিকল্পিত ও এলোমেলো (indiscriminate) যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাবে ব্যাংকক আজ এক 'যানযটের নগরী'। সেক্স-ব্যবসা নির্ভর পর্যটন শিল্প সম্প্রসারণের কারণে এইডস ভয়াবহ আতংকের সৃষ্টি করেছে। ধনী-দরিদ্র, শহর-গ্রাম বৈষম্য সামাজিক সমস্যাকে প্রকট করে তুলেছে। দীর্ঘকাল সামরিক শাসনাধীনে থাকার কারণে শক্তিশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠেনি।

এখানে থাইল্যাণ্ডের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু অবদানমূলক উপাদানের উপর আলোকপাত করা হয়েছে যা আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিবেচনা ও কার্যকর করা যেতে পারে। যদিও উন্নয়নের কোন recipe নেই, কিন্তু থাইল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা যদি কার্যকরভাবে জানতে পারি যে, আমাদেরকে কি করতে হবে এবং কি করা যাবে না, তাহলে আমরা থাইল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরে খুব অল্প সময়ে পৌঁছতে পারবো।

গ্রন্থপঞ্জী

1. IEAT, 1992 , Industrial Estate Authority of Thailand, 1992, *Industrial Estate in Thailand*, Bangkok.
2. Komin, 1989, Suntaree Komin, 1989, *Social Dimensions of Industrialization in Thailand*, National Institute of Development Administration, Bangkok.
3. NIO, 1984, National Identity Office, 1984, *Thailand in the 80s*, Bangkok.
4. Viravan, 1992, Amnuay Viravan, *'Thailand : a most Appropriate Model'* in Bangkok Post, August 18, 1992.
5. WB, 1980, The World Bank, 1980, *Thailand Towards a Development Strategy of Full Participation*, Washingtion D. C.
6. WB, 1992, The World Bank, 1992, *World Development Report*, Washington D. C.